সাঁচিবন্দর ফার্স্ট লেন

সালাদীন

ঐতিহ্য

ভূতাপেক্ষে

প্রথম মুদ্রণের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর আজ 'সাঁচিবন্দর ফার্স্ট লেন' সম্বন্ধে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হচ্ছে, সাহিত্য জগতের প্রবেশ দ্বারে আমি যেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরে বসেছিলাম। অতি সুন্দরী রমণীর যেমন শুধু রূপটাই মানুষের চোখে পড়ে, গুণের কথা মনেই আসে না, সাঁচিবন্দরের বেলায় তাই ঘটে গেল!

কী লিখলাম সেটা কিছু নয়; কাকে নিয়ে লিখলাম সেটাই বড় হয়ে উঠল। ইতোপূর্বে আমার প্রথম উপন্যাস 'বেলাভূমি'তে নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছিলাম বলে মনে একটা অতৃপ্তির ক্ষোভ ছিল। সাঁচিবন্দরে সেটার উপশম করব ভেবে সমসাময়িক সমাজের একটি 'কুখ্যাত' কোণে সাহিত্যের দফতর গুছিয়ে বসলাম। যথাসময়ে 'সাঁচিবন্দর ফার্স্ট লেন' প্রকাশিত হলো। সাড়াও পেলাম অভূতপূর্ব। কিন্তু সাড়ার ধরন-ধারণ দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো, এরা কারা?

সাহিত্যামোদী? না...! অনেকে আবার ক্ষুব্ধ হলেন কোনো পর্নো নেই বলে।

যাক, এদের জিন্দাবাদের স্লোগান ও বুলি শুনে নিজেরই লজ্জা লাগছিল। চোখে-মুখে এদের কামভাব প্রকটিত হয়ে উঠেছে; এদের দিবা-রাত্রির চিন্তা যে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে সে-আনন্দেই এরা মশগুল। 'জায়গাটা কোথায় ভাই? সত্যিই ওরকম একটা মেয়ে ছিল নাকি? থাকলে, কোন্ ঘরটায়?'

আস্তে আস্তে নিজের সম্বন্ধে নিজেই গল্প শুনতে লাগলাম, আমি নাকি বছরের পর বছর ওখানে কাটিয়েছি। অরুণা নামে যে একটা মেয়ে ছিল, সেটাও সত্য কথা। সে যে আমার লেখাপড়া, ভরণ-পোষণের সব ভার নিয়েছিল, তাও শোনা গেল। অমুক নাকি অমুকের কাছে শুনেছে লেখক স্বয়ং অর্থাৎ আমি অমুকের কাছে অকপটে সব স্বীকার করেছি। সে নাকি তার অকৃত্রিম সুহৃদ, অর্থাৎ লেখকের। সুতরাং অবিশ্বাস করার আর কোনো কারণ আমার নিজের কাছেও অবশিষ্ট রইল না!

হতে চেয়েছিলাম লেখক, হয়ে গেলাম ভৌগোলিক; যেন জায়গাটা আবিষ্কার করেছি। আর সে বাবদে আরও খুঁটিনাটি জানার জন্য অনেকেই আমার সাথে আলাপ করতে চায়।

সুধী সমাজ গোপনে বইটা কিনে পড়লেন। ভালো তাদের নিশ্চয় লেগেছে, না হলে এত বই বিক্রি হলো কী করে? কিন্তু বইটার সাহিত্যিক মূল্যায়নের ব্যাপারে তারা একটু সতর্ক উদাসীন্য বজায় রাখলেন। ভাবখানা এমন যে, পতিতালয়ের মতো এমন একটা গর্হিত পাপের জায়গা নিয়ে যে কলমের ব্যবসা করতে পারে, তাকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাই সাহিত্যের আঙ্গিনায় আমাকে একটু দূরেই রবাহূত অচ্ছুতের মতো বসতে হলো।

তবে ব্যতিক্রম করলেন শুধু 'রূপসা' সম্পাদক লুৎফুর রহমান জাহাঙ্গীর। অযাচিতভাবেই তিনি তাঁর পত্রিকায় বইটির সমালোচনা করলেন। আজ তিনি কোথায় আছেন জানি না, তাঁকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে তাঁর সৎসাহসকে।

নতুন প্রজন্মকে বইটি পড়ার সময় প্রায় চার যুগ আগের ঢাকা শহরের সামাজিক পরিবেশ ও রক্ষণশীল সাহিত্যাঙ্গনের কথা ভাবতে হবে। নারীদেহ কিংবা নারী সান্নিধ্য এখনকার মতো তখন যত্রতত্র এত সুলভ ছিল না। এ জাতীয় বই লেখা ও প্রকাশনা তখন দুঃসাহসের ব্যাপারই বটে। সিটি পাবলিশার্স সত্যিই একটা বড় ঝুঁকি নিয়েছিল।

সালাদীন
১৯৯৭

আর ভালো লাগে না। দু'দিন একখানে থাকলেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে অন্য জায়গার জন্য। এভাবে দেহমনকে টেনে নিয়ে চলেছি বহু জায়গায়– শহর, পল্লি, পর্বতাবাস, সমুদ্রসৈকত, আত্মীয়-অনাত্মীয় বহুজনের বাড়ি।

এখন একটা জিনিস বুঝেছি– মনটা আমার অতি মাত্রায় রোমান্টিক আর পরিবেশটা ততোধিক গদ্যময়। যেখানে আছে রাজনীতি, তাস আর খেলাধুলা। মনকে এ পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা যে না করি তা নয়, কিন্তু 'কাকস্য-পরিবেদন'। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অজ্ঞাতনামা Tavern. গল্প করছে Keats, Byron, Shelly আর Leigh Hunt অথবা স্থূলাকৃতি লোলচর্ম Dr. Johnson ব্যঙ্গ আর বিদ্রুপে হাসিয়ে মারছে বন্ধুদের।

গদ্যময় পরিবেশের কল-কোলাহল ভেঙে দেয় এ স্বপ্ন।

***

টাউন সার্ভিসের বাস থেকে নেমে চোখে দেখতে লাগলাম অন্ধকার। বাসের গতিপ্রসূত বায়ু তো বাসের সাথে সাথে ব্রেক দেয় না! তাই একরাশ ধুলো ছড়িয়ে দিয়ে গেল চোখে-মুখে। সে ধুলো লাল-কালো, পল্লি-গ্রামের সাদা ধুলো নয়। ধুলোর দেয়াল ভেদ করে এসে দাঁড়ালাম এক পান-বিড়ির দোকানের সামনে। আমার সামনে আর একটি আমি। বহুদিন আয়না দেখিনি। দেখলেও তেমন লক্ষ করিনি। আধ-ভাঙা একটা চিরুনি বরাবরই পকেটে থাকে। দোকানিকে একটা সিগারেটের কথা বলে ঋজু হয়ে দাঁড়ালাম আয়নার সামনে। মুখ আমার কোনো কালেই আপেল ছিল না, কিন্তু তাই বলে আজ এক্কেবারে সোডার বোতল! খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারা মুখে। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। মুখ ক্রমেই যেভাবে ভেতরের দিকে যাচ্ছে, পরেরবার 'সেভ' করতে মুখের মাঝে বেলুন ফুলিয়ে দিতে হবে, না হয় চামড়া উঠে আসবে ব্লেডের

সাথে। আর চোখ! তাও ভেতরে যাচ্ছে; যেন শীতকালের কুয়ো।

জীবনের পেছন দিকে চাইতেই মনশ্চক্ষে কার্নিভালের 'Skill shooting'- এর চক্রের মতো ভেসে উঠল Out of Bounds-এর সুদর্শন কালো চক্রটি। আর সে চক্রের আবর্ত থেকে ধীরে ধীরে খুলে পড়তে লাগল আমারই জীবন-অধ্যায়ের আলেখ্যায়িত একটি ফিতা।

সাঁচিবন্দর ফার্স্ট লেন। কী করে এ নাম হলো! গলির উল্টো মাথাটা নদীর সাথে যেখানে গিয়ে লেগেছে, এককালে সেটা সাঁচিপানের আড়ৎখানা ছিল। মফস্বল থেকে নৌকায় বয়ে-আনা সাঁচিপানের খারিগুলো স্তূপাকৃতি হয়ে উঠত গলির মাথায়। নগর-বালাদের ঠোঁট রাঙিয়ে উঠত সাঁচিপানের রসে। উষ্ণীষ মাথায় দিয়ে তলওয়ার ঝুলিয়ে স্বামী যেত ফৌজদারের দরবারে কুর্নিশ করতে। স্ত্রী সোহাগ ভরে বাড়িয়ে দিত সাঁচিপানের খিলি– যাতে থাকত বত্রিশ রকম বাদশাহি জাতের মসল্লা। খোশবুতে ভুরভুর করত বাতাস। স্ত্রীর মাথা বুকে টেনে নিতেই মুদিত হয়ে যেত সুরমা মাখা আঁখিপল্লব। জরিদার পাড়ের ওড়না চমকে উঠত ক্ষণিকের তরে। সাঁচিপানের রসে রঞ্জিত ওষ্ঠ হয়ে উঠত রক্ত-জবা।

মেহমান আসত বাড়িতে। বহু দূরের লোক। সমরখন্দ, বোখারা, দিল্লি, পাঞ্জাব থেকে। রৌপ্যোজ্জ্বল বাটা হাতে পান নিয়ে এসে দাঁড়াত দাদি। নেকাবে তার মুখ ঢাকা। শরবত খেয়ে পান তুলে নিত সে আমীর কিংবা যোদ্ধা মেহমান। খেয়ে প্রশংসা করত। পানের নয়, এদেশেরও নয়– পান যে বানিয়েছে তার অন্তঃপুরের কাঁকন নিক্কণ সুডোল হাতের অধিকারিণীর। তারপর ফেরার সময় বারবার ফিরে তাকাত দোতলার জানালাগুলোর দিকে। প্রায়ই দেখা যেত ইপ্সিত-জন। গবাক্ষে আন্দোলিত ওড়নার আঁচল, একজোড়া চোখের চকিত চাহনি। দয়িতার হাতে দয়িতের পান খাওয়া। বিয়ের আসনে শুভদৃষ্টি বিনিময়ের আগে 'পানচিনি' দেওয়া। সমাজে পান তখন প্রেমের দূত, বিদায়ের উপহার, মিলনের মাধ্যম।

আবার এ পানের মাঝেই দেওয়া হতো বিষ-জহর। অবাঞ্ছিত স্বামী; মন দেওয়া-নেওয়া চলছে আর একজনের সাথে। সে প্রেমিক মধ্য রাতে উদ্যানে

এসে দাঁড়ায়। ঘোড়া বেঁধে আসে দূরে। পান খেয়ে স্বামী হয়ে যায় অজ্ঞান। কখনোবা হয় মৃত্যু।

তারপর কবির দল বাঁধে গান। সুর করে চাঁদনি রাতে– সত্য আর কল্পনা মিশ্রিত সে স্বামী-হন্তী রূপসীর অবৈধ প্রেমের পুঁথি পড়ে গাঁয়ের লোক। কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তাদের মন।

আরও আছে পান-পড়া। যুবক নাগর বেহুঁশ হয়ে ঘোরে প্রেমিকার জন্য। পথে পথে বিনিদ্র রজনী যাপন করে। ওস্তাদ-গুণীনের কাছে ধর্ণা দেয় তরুণ। তিন আশরফি দিয়ে নেয় একটা পড়া-পান। কোনো রকমে যদি সে পান খাওয়ানো যায়! সে রাজকন্যে হোক আর মন্ত্রীকন্যে হোক– নিস্তার নেই তার। দৌড়ে আসতে হবে তার কাছে, সব বাধা তুচ্ছ করে।

সে পান থরে থরে এসে জড়ো হতো নদীর পাড়ে–এই সাঁচিবন্দর গলির মাথায়।

সেসব বাদশাহি আমলের কথা। সাঁচিবন্দরের দু'পাশের বাড়িগুলো সাক্ষ্য দেয়, তারা কত পুরনো। বাদশাহি আমলের বাড়ি। চুন নেই, পলেস্তরা নেই, দাঁত বের করা জাফরি ইটের গাঁথুনি। ছোট ছোট গরাদহীন জানালা, দোতলার দিকে কুঞ্চিত অপরিসর ক্ষুদ্র সিঁড়ি। প্রায়ই দু'তিন ধাপ ভেঙে এক হয়ে গিয়েছে। তাদের পাশে দেওয়ালের মাঝে চৌকুনো খাদ– বাতি রাখার জায়গা। সে বাতি ঝালর বাতি নয়, কুপি কিংবা ছোট ছোট মশাল। এখনো লক্ষ করলে দেখা যাবে তাদের কালো শীষ কালের সাথে সংগ্রাম করে টিকে আছে দেওয়ালের গায়ে। সে বাতি যারা জ্বালাত, তারা নেই, সে বাতিও নেই। আছে শুধু তাদের আহ্নিক কর্মসূচির একটা ক্ষুদ্র নিদর্শন।

সাঁচিবন্দরের একই ইতিহাস। যুদ্ধ ফেরত ক্লান্ত সৈনিকেরা আস্তাবলে ঘোড়া রেখে হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ত সাঁচিবন্দর গলিতে। পকেটে ঝনঝন করছে বাদশাহি আশরফি। সাঁচিবন্দরের মেয়েদের পায়েও ঝঙ্কার দিয়ে উঠত নূপুর। এখানেও তলওয়ার বের হয়ে পড়ত কোষ থেকে। বারাঙ্গনা নিয়ে দ্বন্দ্ব হতো দু'জনের। শত যুদ্ধ-ফেরত বীরের দেহ লুটিয়ে পড়ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অসির আঘাতে। গভীর রাতে চুপি চুপি বারাঙ্গনা আর বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ফেলে দিয়ে আসত মৃত সৈনিকের দেহ, বুড়িগঙ্গার জলে। ফিরে এসে সোহাগের অতল তলে ডুবে যেত দু'জন। কখনোবা গভীর রাতে ফৌজদারের সিপাহি আঘাত করত দুয়ারে : 'কোহই হায়?'

তারপর ঘুষ নিয়ে আবার চলে যেত তারা। আরও আছে। মাঝে মাঝে ফরমাস আসত সাহেবজাদা, ফৌজদারজাদা কিংবা ধনী শেঠদের কাছ থেকে।

তাদের দূত এসে দাঁড়াত সর্দার বুড়ির কাছে– ভালো মেয়ে চাই। বয়স কম হওয়া চাই। গায়ের ঘাম ছুটে যেত বুড়ির।

কিন্তু খুশিও হতো খুব। একে দেখে, ওকে দেখে ঠিক করা হতো হয়তো জমিলা নামের কোনো মেয়েকে।

ফৌজদারজাদার পালকি দাঁড়িয়ে আছে দুয়ারে। ভয় আর খুশির অবিমিশ্র অনুভূতি দোলা দেয় জমিলার মনে। গোসল করে, ফুলের তেল লাগিয়ে জরিদার বানারসিটা বের করে সে। কাশ্মীরের যুদ্ধ-ফেরত এক সৈনিক তাকে দিয়েছিল এটা। খাঁটি জিনিস। সে সৈনিক এখন কোথায় জমিলা জানে না। কোনো একটা যুদ্ধে গিয়ে সে আর ফেরেনি।

জমিলা প্রসাধন করে। সর্দার বুড়ি দাঁড়িয়ে তদারক করছে, খুঁত ধরিয়ে দিচ্ছে বারেবারে। সাবধান করে দিচ্ছে, আদব-ব্যবহারে যেন ভুলচুক না হয়। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, বড় লোকদের একবার খুশি করতে পারলে সারাজীবন আর কষ্ট করতে হবে না। পালকিতে চড়ার আগে মুখে ঠোনা মেরে তাকে বিদায় দেয় সর্দার বুড়ি। অন্য মেয়েগুলো হাসি-মস্করা করে একটু। ছয় বেয়ারার পালকি আওয়াজ তুলে গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেদিকে চেয়ে মেয়েরা নিজেদের কথা বলাবলি করে, কে কবে কোথায় গিয়েছিল– সে কী আদর, ধুমধাম!

আবার এমন মেয়েও আছে, যাদের কোনো সৌভাগ্য জীবনেও হয়নি। কে নেবে তাদের! এখানেই ভাত জোটে না। চেহারা তাদের খারাপ। রঙ তাদের কালো। স্বাস্থ্য নেই। তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু সর্দার বুড়িকে খুশি করেও এসব বায়না পাওয়া যায়। জমিলার মতো সুন্দরী যারা নয়, তাদের ভাগ্যেও এমন দু'-এক লগ্ন এসেছে। কিন্তু তাতে ভয় আছে। নেশার ঘোর কেটে গেলে ফৌজদারজাদা চোখ মেলে দেখলেন বাজে মাল পাচার করা হয়েছে। অমনি লোক ছুটবে সর্দার বুড়ির কাছে।

মাঝে মাঝে যুদ্ধ জয় করে ফিরতেন নওয়াব, সিপাহসালার। নগর সাজানো হতো, উৎসবের চূড়ান্ত হতো ক'দিন। সাঁচিবন্দরও সাজানো হতো। মেয়েরা উঁকি দিয়ে দেখত শোভাযাত্রা। হাওদায় বসে আছেন নওয়াব। বাজনা বাজছে। তোপধ্বনিতে কেঁপে উঠত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি। তারা দেখত তাদের নাগরদের। ঘোড়ায় চড়ে বর্শা হাতে চলেছে মিছিলের মাঝে। চোখাচোখি হতো। মুখ টিপে হাসা হতো অর্থাৎ আজ সন্ধ্যায় এখানে গমগম করবে লোকে। মেয়েরা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার আগেই যার যার দুয়ারে দাঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু এই সাঁচিবন্দরের কায়দা-কানুন অন্য রকম। এক হাতে টাকা, আর এক হাতে পণ্য।

সাঁচিবন্দরে সূর্য দেখা যায় দ্বিপ্রহরে ঘণ্টা তিনেকের জন্য। ও সময়েই সব কাজ চলে। তেল লাগানো, কাপড় ধোওয়া, গোসল। কলে পানি আসে সকালে আর বিকেলে। কিন্তু ওতে ওদের কুলোয় না। সে সময় লাগে এক কাড়াকাড়ি। গালিগালাজ সেখানে ভদ্র কথার সামিল। চুলোচুলিটা কিছু ধর্তব্যের মাঝে। যার যার পানি উঠিয়ে রাখে নিজেরা। ঠিকমতো নজর না রাখলে ওটুকু পানিও চুরি হয়ে যাবে। ছোঁ মেরে কে যে কোন সময় নিয়ে যাবে টেরও পাওয়া যাবে না।

শোয়া থেকে ওঠে ওরা ন'টা-দশটার আগে নয়। তারপর ধীরে ধীরে জড়ো হয় ভাঙা কুয়োটার পাড়ে। বলাবলি করে গত রাতের কথা। কার কাছে কেমন এসেছিল মানুষ।

গন্দা একপাশে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। রাতে কেঁদেছে মনে হয়। হীরা বলল, দে তো বোন বিড়িটা, একটা টান দি।

গন্দা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, মাগিদের জ্বালায় শান্তিতে একটা বিড়ি খাওয়ারও জো নেই।–বলেই সুখ টান মেরে বিড়িটা হীরার দিকে ছুঁড়ে মারল।

হীরা বলল, রাতে এক বান্ডিল বিড়ি কিনে রেখেছি। সকালে হাত দিয়ে দেখি একটিও নেই। কুদ্দুসা হারামজাদা হাতড়িয়ে নিয়ে গেছে সব।

কুদ্দুস হীরার লোক। হীরার সাথে থাকে। এদের অনেকেরই নিজস্ব লোক আছে। দেখাশোনা করে, খবরদারি করে, নতুন গ্রাহকও যোগাড় করে। এখানকার পরিভাষায় ওদের নামও আছে একটা। বাড়িঘর নেই। এখানেই থাকে, এখানেই খায়। স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে এখানকার মেয়েদের সাথে আর তাদের রোজগারে ভাগ বসায়।

গন্দা আবার খেঁকিয়ে ওঠে, থাক, থাক, আর গলাবাজি করিসনে। এক বান্ডিল বিড়ি তুই কিনবি!

বেঁটে লতিকা টিপ্পনি কাটে। কেন, হীরা বুঝি বিড়ি কিনে না? এই তো সেদিন দশ হাজার বিড়ি কিনল। এ যে সে বিড়ি নয়, এক একটা এক হাত লম্বা।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। হীরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লতিকার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। হীরা কুঞ্জুস, এ সবাই জানে। তার শুধু টাকা জমানোর নেশা। কিছুদিন আগে শ'দুয়েক টাকা তার চুরি হয়ে যায়। এ নিয়ে সবার সাথে দু'-একবার চুলোচুলি, গালাগালিও হয়ে গিয়েছে মেয়েটির। বাড়িউলী গম্ভীরভাবে মন্তব্য করে, জিনিস যায় যার, ইমান যায় তার।

হীরা যাকে তাকে সন্দেহ করেছে। এরপর থেকে কুদ্দুসকে সে রেখেছে। এ জায়গায় দিনকতেক চা-দোকানের ব্যবসা করেছিল কুদ্দুস। কিন্তু এখানে

ব্যবসা করে টিকে থাকা যারতার কাজ নয়। পাড়ার মেয়েরা বাকি নিয়ে গিয়ে দোকানের আর কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। অচেনা খদ্দেররা স্তিমিত আলোতে চা খেয়ে অচল পয়সা দিয়ে গিয়েছে। পাড়ার গুণ্ডারা বিনি পয়সায় যখন যা ইচ্ছা তাই খেয়েছে। সুতরাং কুদ্দুসের দোকানে মাস কয়েকের মাঝে গোটা চারেক ভাঙা কাপ আর খানতিনেক তেপায়া, টুল-টেবিল আর চৌকি ছাড়া কিছুই রইল না। কুদ্দুস ঠিক করল এসব বিক্রি করে এবার অন্য যে কোনো জায়গায় একটা ছোটখাটো পানের দোকান দেবে। এ জায়গায় দোকান করা তার চলবে না।

হীরা এসে বলল, পাগল হলি তুই! জায়গা ছেড়ে কোথায় যাবি?

তারপর লোক ডেকে কুদ্দুসের জিনিসপত্র নিজের ঘরে ঢুকিয়ে বলল, তুই এখানে থাকবি আমার কাছে, কেমন?

আকাশের চাঁদ এসে পড়ল কুদ্দুসের হাতে। হীরাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে সে বলল, সাচ?

হীরা বলল, সত্যি।

এত বড় সৌভাগ্যের কথা কুদ্দুস কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিন। অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীসাথিদের পাল্লায় পড়ে এ রাস্তায় পা দেয় সে। ক্রমে ক্রমে বাড়িঘরের সাথে সংশ্রবহীন হয়ে পড়ল। সবকিছু খুইয়ে যখন সে 'কানাকুত্তা' হওয়ার জোগাড়, তখন হীরার লোক হওয়া কত বড় সৌভাগ্যের কথা, সে শুধু সে-ই বুঝে। কিন্তু কুদ্দুসের বংশ গরিমা ছিল। কথায় কথায় সে বলত তার পিতামহ-প্রপিতামহের কথা। নবাবের খাশ গাড়ির চালক ছিল তারা বংশ পরম্পরায়। কিন্তু মোটর আবিষ্কারের সাথে সাথে তাদের সে ঐতিহ্যবাহী চাকরি এখন পেশাদারিতে দাঁড়াল। ঘোড়ার বিচালি সংগ্রহ করা, আস্তাবলে রাত কাটানো কুদ্দুসের কর্ম নয়।

উদগত খুশির স্বর চেপে গম্ভীর হয়ে সে বলল, না রে হীরা! আমি এখানে থাকব না। জানিস তো মহল্লায় আমার বাপ-চাচাদের কত নাম-ডাক।

হীরা ঠোঁট বেঁকিয়ে ভুরু উল্টিয়ে বলল, ওরে বাব্বা, সারাজীবন এখানে কাটিয়ে এখন বাপ-চাচার মান!

যা হোক, কুদ্দুস রইল হীরার কাছে। কিন্তু যে আশায় হীরা রাখল কুদ্দুসকে, সে গুড়ে বালি। নতুন লোক জোটানোর দিকে কুদ্দুসের খেয়াল নেই। বিশেষ করে চুরি-টুরির ভয়ে হীরা রেখেছে তাকে, কিন্তু বাইরের দশ চোরের অভাব কুদ্দুস একাই পূরণ করছে। কথায় বলে 'কৃপণের ধন দশে খায়।' কুদ্দুস রোজ সিনেমা দেখে। বাহারে শার্ট কিনে। বছরে তিনবার জুতা

কিনে। আর তা দেখে হীরার চোখ কপালে ওঠে। কিছু বললে মেরে দাগ পড়িয়ে দেয় গায়ে। চেঁচিয়ে পাড়া জড়ো করে, হারামজাদির লাইগ্যা আমি ঘরবাড়ি ছাইড়া আইলাম...ইত্যাদি।

বাসন্তীর অবস্থা ভালো। বয়সও আছে, রূপও আছে। নিজের কোনো দালাল সে রাখে না। রাতে কাছে দা নিয়ে শোয়।

শোয়া থেকে উঠেই ও ভাত রাঁধতে বসেছে। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় লাকড়ি ভিজে আছে। ভিজাকাঠে আগুন ধরতে চায় না সহজে। ক্ষুদ্র পাকেরঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ফুঁ দিতে দিতে চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে তার। এমন সময় পুষ্প এসে দাঁড়াল। ছোট্ট মেয়ে, নাদুস-নুদুস গোল-গাল চেহারা, রঙ যদিও খুব ফরসা নয়। অবশ্য চুলের জন্য তাকে বেশ দেখায়। এমন চুল এ গলিতে কেউ দেখেনি আর। যেমনি কালো, তেমনি ঘন। হাসিতে তার জুড়ি নেই। সামান্য কিছু হলেই হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। কিন্তু বাড়িউলীর দু'চক্ষের বিষ এই মেয়েটি। কারণ খোঁচা দিয়ে কথা বলতে এ পাড়ায় তার আর জুড়ি নেই। কিন্তু বাসন্তীর রাশভারী মেজাজ। তাকে পুষ্পও ভয় করে।

আগুন ধরাতে না পেরে ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছে বাসন্তী। বাঁশের চোঙটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, হারামজাদা মেঘের লাইগ্যা আর ভাত খাওন যাইব না। দোকান থেইকা আনাইতে অইব আইজ।

পুষ্প বলল, ক্যান দিদি, লাকড়িগুলো ঘুইরা রাখলেই পারতা। কত বলি একটা লোক রাখ। এত টাকা তোমার খাইব কে দিদি?

বাসন্তী ধমক দিয়ে ওঠে, থাম মাইয়্যা। মুরুব্বিয়ানা করবার আইছে!

পুষ্প কিছু না বলে বাঁশের চোঙটা হাতে নিয়ে আগুন ধরাতে বসল।

'হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে...' বাসন্তীর কথা শেষ হবার আগেই দপ করে আগুন জ্বলে উঠল।

এবার বাসন্তী খুশি হয়ে বলে উঠল, কেমনে ধরালি বোন? আমার তো নাকের জলে, চোখের জলে একাকার।

পুষ্প চুলার পাশের চেরাগটা হাতে নিয়ে বলল, ক্যান, একটু তেল দিলে আর তোমার অত কষ্ট করবার লাগত না। লও, এখন কী আছে, রান্ধ। আমি দেহি শুকনা কিছু পাই নিকি।

মিনিট দু'-এক পরে তিন-চারখানা শুকনো লাকড়ি এনে বাসন্তীর সামনে ফেলে বলল, মাসি ঘুমাইতেছে, চট কইরা নিয়া আইলাম। টপাটপ আগুনে দেও। মাগি উইঠা দেখলে আবার লাগব।

বাসন্তী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, অইছে, হে কি আর টের পাইব না? এখন সারাদিন তার গাইল খাইবে কে?

পুষ্প চোখ ঘুরিয়ে বলল, গাইল দিলেই অইল? তুমি আমার কথা কইও। তার কাছে আমি পাঁচ টেকা পাই। চিল্লা-চিল্লি করলে কমু টেকা দেও।

তারপর একটু থেমে আবার বলল, টেকা তো পামু না এটা আমি আগেই জানি। এ কইরা যদি কিছু উসুল করতে পারি।

তারপর হঠাৎ বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, যাই দেহি, ওহানে আবার হীরারে লইয়া কী অইতাছে!

পুষ্প বেরিয়ে যেতেই বাসন্তী ডাক দিল, পুষ্পী, ও পুষ্পী, শোন!

বাইরে থেকেই জবাব এল, কী?

এ বেলা আমার এখানে খাইবি কিন্তু।

মেয়েটির উপর বড় মায়া বাসন্তীর। বাসন্তী রাসভারী, ও কথা কম বলে, কেউ বাসন্তীর গায়ে পড়ে কথা বলতে সাহস করে না। কিন্তু পুষ্প মেয়েটা কিছু দুরন্ত। ওর দুরন্তপনাটা বাসন্তীর ভালোই লাগে।

বাসন্তীর মনে পড়ে, বছর দশেক আগে পুষ্পকে বেচে যায় একটি লোক। দেশে তখন দুর্ভিক্ষ। চাউলের সের দু'টাকা। তা-ও পাওয়া যায় না। সে লোকটি নাকি পুষ্পর মামা। বেচে গিয়েছিল ও ঘরের হরসুন্দরীর কাছে মাত্র বিশ টাকায়। বাসন্তী তখন বছর নয়েকের। বছর চারেক হয় হরসুন্দরী মারা গেছে। তারপর পুষ্পকে নিয়ে কত ঝগড়া-ফ্যাসাদ। কতজনে ফুসলায়, কতজনে নিয়ে যেতে চায়। আলীম সর্দার রক্ষা করেছে মেয়েটিকে। টাকা-পয়সা বেশি রেখে যেতে পারেনি হরসুন্দরী। এদিকে কাজে নামার মতো বয়সও হয়নি পুষ্পর। সে অনেক কথা।

বছর দেড়েক হয় কাজে নেমেছে। আর রোজগারও মন্দ নয়। ইচ্ছে করলে সে দিনে বিশ-তিরিশ টাকা ঢালতে পারে। অথচ কী যে স্বভাব মেয়েটার, সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই। সন্ধ্যার সময় যাবে সিনেমা দেখতে। না হয় ঘর বন্ধ করে শুয়ে থাকবে। যা কামাবে দু'হাতে খরচ করবে। সিনেমা দেখে আসে সবাইকে নিয়ে। তারপর দেখেআসা নায়িকার অনুকরণে অভিনয় করে দেখাবে সবাইকে। খিল খিল করে হাসবে। গানের গলাও মন্দ নয় মেয়েটির।

বাড়িওয়ালী বলেছে গানের মাস্টার রাখবে তার জন্য। কিন্তু আসলে রাখে না। পুষ্প তাগাদা দিলে বাড়িওয়ালী খেঁকিয়ে ওঠে, গান! গান দিয়া কী অইবো? গান মানষে গামো ফনে শোনে। গতর ঠিক রাখ মাগি।

সেদিন পুষ্প বিছানায় উপুড় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কার সাথে নাকি ইদানীং ভাব হয়েছে ওর। বড় লোকের পোলা। প্রায়ই আসে। বাড়িওয়ালীর সন্দেহ হয়। অন্য সবেরও একই অবস্থা। তাই বাড়িওয়ালী মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে, রঙ্গো কর, মজা কর–এইখানেই সব পাবি। বাইরে পা বাড়াবি তো ঠ্যাং কাইটা দিমু!